এক যে ছিল বাঙ্গালাহ-১

ঈশা খাঁ

মহিম জোবায়ের

বাতায়ন
পাবলিকেশন

প্রারম্ভিকা

আমাদের আজকের গল্পটির শুরু আজি হইতে প্রায় সাড়ে চারিশত বছর পূর্বের কোনো এক শ্রাবণ মাসের ঘনঘোর সন্ধ্যায়। শ্রাবণে সাধারণত যেমন হয়, সেদিনও ঠিক তেমনই সকাল থেকে অঝোর ধারায় বৃষ্টির কোনো বিরাম নেই। তাই দুপুর নাগাদ সর-ই-লস্কর নুর খানের সাথে দৈনন্দিন মিটিংটা চুকিয়েই বাংলার সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ বেশ কয়েক বোতল মদিরা নিয়ে কিছুটা ব্যক্তিগত সময় কাটানোর উদ্দেশ্যে বসে ছিলেন।

পারস্য হইতে আগত অতি উৎকৃষ্ট মানের আঙুরের মদিরা। সে মদিরা দুই প্রহর ধরে পানের পর খুব একটা হুঁশ জ্ঞান থাকে না; মাহমুদ শাহেরও ছিল না। তাই প্রাসাদের দাখিল দরওয়াজার ঠিক আগে যে জলের ফোয়ারাটা আছে সেথায় মাতাল সুলতান কর্দমাক্ত মাটিতে ল্যাটা মেরে বসে, আসমানের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকায়ে ছিলেন। এদিকে মাগরিবের ওয়াক্ত হয়ে আসতেছে, অন্যদিকে সুলতানের মাটিতে বসাটা ঠিক দুরস্ত না। কিন্তু এই কথাগুলো সুলতানকে বলার মতো সাহস এখনো কোনো কর্মচারী করে উঠতে পারে নাই। একে তো মাহমুদ শাহ এমনেই লোক খুব একটা সুবিধার না, তার ওপর এখন সে ঘোরতর মাতাল। কিছুদিন আগেই শহরের কাজি হারেমের এক বেগমকে দিয়া সুপারিশ করিয়েছিলেন, সুলতান যেন মদের দুর্গন্ধ লইয়া অন্তত মসজিদে প্রবেশ না করেন। ফলাফল হিসেবে সুলতান বেগমের ডান কান কেটে হারেম থেকে বের করে দিয়েছেন—যদিও কাজিকে কিছুই বলেন নাই। লোকে ঝি মেরে বউ শেখায়, সুলতান বউ মেরে কাজিকে শেখান। এরূপ পরিস্থিতিতে উলটাপালটা কিছু বলে ফেলে প্রাণ খোয়ানোর ঝুকিটা প্রাসাদের কোনো কর্মচারীই নিতে রাজি নয়।

এদিকে বিরতিহীন বৃষ্টির মাঝে পরওয়ারদিগারের নিকট হতে কোনো এক চিহ্ন প্রাপ্তির আশায় সুলতান সেই যে মুখ তুলেছিলেন, সম্ভবত মদিরার নেশায়ই তা আর নামায় লইতে খেয়াল আসে নাই।

অল্প কিছুদিন মাত্র হয়, তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র ফিরোজ শাহকে হত্যা করে বাংলার মসনদে বসেছেন। লোকে তাতে অবশ্য কিছুমাত্র আশ্চর্য হয় নাই—ভাইয়ের ছেলেকে মেরে বাংলার সিংহাসনে বসা নতুন তো নয়ই, অস্বাভাবিক ঘটনাও নয়। সাধে তো আর এই জনপদ বুলগাকপুর নামে পরিচিত হয় নাই! উপরন্তু ভাতিজার নিজের আচরণ ছিল নিতান্ত গর্দভের মতো—অন্তত গিয়াসউদ্দিন মাহমুদের তেমনটাই মতামত। প্রবাদে বলে, বাপ কা ব্যাটা আর সিপাইকা ঘোড়া, কুচ ভি নেহি তো থোড়া থোড়া। ফিরোজ শাহ তাঁর বাপ নসরত শাহ থেকে ওই 'থোড়া থোড়া' বৈশিষ্ট্যই আসলে পেয়েছিলেন। নসরত শাহ নিজের জীবদ্দশায় আসাম আক্রমণ করে বিশেষ কোনো সুবিধা করতে পারেন নাই। তাই ফিরোজ গদীতে বসার পর সবাই ভেবেছিল, আসামে নিযুক্ত বাঙালি পাইক-পেয়াদা ফেরত আনা হবে। সিংহাসনে নিজের অবস্থান পোক্ত করতে নতুন সুলতানের জন্য সেটা ছিল খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। তাই বাঙলার মায়েরা যখন ঘরের ছেলে পাহাড়-জঙ্গল ছেড়ে পুনরায় ঘরে ফেরার আশা বাঁধতে শুরু করেছেন, এমতাবস্থায় সুলতানি হুকুম হলো, আসাম অভিযান আরও জোরদার করা হবে। এ ছাড়া সুলতানের অভিষেক অনুষ্ঠানের খরচা তোলার নিমিত্তে নতুন একটা খাজনার ফরমানও জারি করা হইল।

এরই মাঝে একদিন মাহমুদ জানতে পারলেন, তাঁর ভাই সুলতান নসরত আসলে গুটি বসন্ত হয়ে পটল তোলেন নাই; বরং লোকে যাতে ভয়ে তাঁর মরদেহ হইতে দূরে থাকে সেজন্যই এরূপ প্রচারণা চালানো হয়েছে। আর পুরো ব্যাপারটার নাটের গুরু নাকি তার ভাতিজা ফিরোজ নিজে! মুখবির ভানু দাসের পাক্কা খবর; এদিক-সেদিক হওয়ার উপায় নেই। প্রাসাদের খানসামা হিসেবে লোকটা কাজে আছে পাক্কা একুশ বছর। আদতে মাহমুদের পিতা আলাউদ্দিন হুসেন শাহ নিজে ভানুকে খাস খানসামা হিসেবে নিয়োগ দিয়াছিলেন। নসরত, মাহমুদ-সহ হুসেন শাহের আরও ষোলোটি পুত্রের প্রায় সবাই এই ভানুর কোলে-পিঠেই মানুষ। অতীব ধুরন্ধর হওয়া সত্ত্বেও এই ভানু দাস তার প্রয়াত মালিক হুসেন শাহের সন্তানাদির প্রতি ভালোবাসাটি ত্যাগ করতে পারেন নাই। সেজন্যই নাকি নিজের ছেলের ষড়যন্ত্রে নসরত শাহকে খুন হয়ে যেতে দেখে সে আর সহ্য করতে না পেরে একদিন মাহমুদের কাছে নালিশ নিয়ে এসেছিল।

এক দিকে মোড় নিল। প্রথম সিদ্ধান্তটা হলো, পর্তুগিজদের একটা আশ্রয় দেওয়া। শুজা খান লোদিকে ডেকে তিনি আগামীকাল ভোরেই চাটগাঁও রওনা হয়ে যেতে বললেন। গিয়ে সে ফিরিঙ্গিদের বলবে, সুলতান তাদের ওপর খুব সন্তুষ্ট। তাদের সম্মানার্থে সুলতান বিশেষ ভোজসভা ও আনন্দ উৎসবের আয়োজন করার আদেশ দিয়েছেন। তবে কুঠি স্থাপনের ব্যাপারে সুলতানের কিছু শর্ত আছে। সে শর্ত আলোচনা ভোজসভায় হবে। ভোজ সভা শুরু হলে পর্তুগিজদের জানানো হবে, বাঙ্গালার সুলতান চোর-ডাকাতের সাথে বন্ধুত্ব করেন না। এর পরপরই পর্তুগিজদের যে যেখানে আছে গ্রেফতার করে যেন রাজধানীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

সুলতান মাহমুদের জানা আছে, এই ফিরিঙ্গিগুলোকে ধরলে গোয়ার ফিরিঙ্গি গভর্নর নুনো-দঁ-কুনহা অবশ্যই কাউকে না কাউকে তাদের মুক্তির দাবিতে আলোচনায় পাঠাবে। তখন সুলতান বন্দিদের ছেড়ে দেওয়ার শর্তে শের খানের বিরুদ্ধে সাহায্য আদায় করে নেবেন। পর্তুগিজরা কুঠির অনুমতি পাবে ঠিকই; কিন্তু ডাকাতির মাল দিয়ে খুশি করে তা মিলবে না। ফিরিঙ্গিরা তো ব্যবসায়ী, সুলতান এই বাঙ্গালার জমিন তাদের রক্তের দামে কিনিয়ে তবে ছাড়বেন। সুলতান মাহমুদের সিদ্ধান্তে এই প্রথম বাংলায় ইউরোপীয়দের একটা ফুটহোল্ড তৈরির ব্যবস্থা হয়ে গেল—যদিও তা পর্তুগিজদের শেষ পর্যন্ত সত্যিই রক্তের দামে কিনতে হয়েছিল।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটা সুলতান নিলেন এশার নামাজের পর। খাওয়া-দাওয়া শেষে হারেমে ঢোকা মাত্রই তার পটবিবি জানালেন, মেজো মেয়ে সৈয়দা মোমেনা খাতুনের বিবাহের সম্বন্ধ এসেছে। পাত্র আর কেউ নয়, সরাইলের হিন্দু জমিদার কালিদাস গজদানি। শুনেই সুলতান কিছুক্ষণের জন্য ক্রোধে বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি আরবের অরিজিনাল সৈয়দ বংশের সন্তান। আর কোথাকার কোন মালাউনের বাচ্চা নাকি তার মেয়ের জামাই হতে চায়! এত বড় আস্পর্ধা! তার পিতা হুসেন শাহ জীবিত থাকলে তো মালাউনের বাচ্চার জ্যান্ত খাল তুলে ফেলতেন। সুলতান বিবির সাথে বিছানায় ছিলেন। আর বিবির সাথে বিছানায় কোনো পুরুষই খুব একটা দীর্ঘ সময় রাগান্বিত থাকতে পারেন না। তাই সব কিছু শান্ত হওয়ার পর সুলতানকে বিবি বোঝালেন, আসলে মোমেনা খাতুনের সাথে গজদানির প্রেম চলতেছে বেশ

দীর্ঘদিন যাবৎ। কেউ সাহস করে কথাটা সুলতানকে জানাইতে পারে নাই। এখন আপোসে মেয়ে না দিলে সে স্বেচ্ছায় বের হয়ে যাইতে পারে। তাতে সুলতানের কি ইজ্জত থাকবে?

বিবির আলিঙ্গনে থাকা সুলতান নারী-পুরুষের ব্যাপারটা বিবেচনায় না এনে পারলেন না। এ এমনই বস্তু, একবার একে অপরকে পছন্দ হয়ে গেলে আর কারও কিছু করার নাই। বাধা দেওয়ার চেষ্টায় শুধুই দুর্নাম বৃদ্ধি। আর গজদানিও ছেলে হিসেবে নিতান্ত মন্দ না। সত্য বলতে, রাজধানী গৌড় থেকে ভাটি মাত্র দুই দিনের পথ। এই ভাটি নিয়ন্ত্রণে সেখানে একটা শক্ত মিত্র তার প্রয়োজন। শের খান আক্রমণ করলে তার গৌড় ছেড়ে পূর্ব বঙ্গে সরে আসার প্রয়োজন হতে পারে। সাঁতপাঁচ ভেবে সুলতান সিদ্ধান্ত নিলেন, ভাটিতে একটা মেয়ে দেওয়া যায়। বিবিকে বললেন, যে সম্বন্ধ নিয়া আসছে তাকে জানাও, শরিয়তে বিধর্মীর কাছে মেয়ে বিয়ে দেওয়ার অনুমতি নাই। এই কাজ করে আমি ধর্ম নষ্ট করতে পারব না। তবে যদি কালিদাস মুসলমান হয় তবে আলোচনা চলতে পারে।

আলোচনা চলল। সরাইলের জমিদার কালিদাস গজদানি কালেমা পড়ে হয়ে গেলেন সুলায়মান খান। তার সাথে সৈয়দা মোমেনা খাতুনের বিয়েও হয়ে গেল। এই সুলায়মান-মোমেনা দম্পতির ঘর আলো করে এলো দুই পুত্র সন্তান মসনদ-ই-আলা ঈশা খান আর ইসমাইল খান।

ইউরোপিয়ানদের স্থান দেওয়া আর হিন্দুর ছেলের কাছে মেয়ে বিবাহ দেওয়া।

সুলতানের সেদিনের এই দুই সিদ্ধান্তের মাঝে কোনটি বেশি গুরুত্ববহ ছিল তা পরম করুণাময়ই ভালো জানেন।

অধ্যায়-১

বাঙ্গালার এক রাজপুত্র, কপাল ছিল পোড়া
তবু তাহার আগুন ছিল বুকের পাটা ভরা...

ছয় নাম্বার চাবুকটা উড়ে এসে পিঠে পরতেই ঈশা টের পেল, তার টেকনিক আসলে কাজে খাটতেছে না। উটের চামড়ার চাবুকের সাথে তার পরিচয় এই প্রথম নয়। তাই কোনো কৌশল করেই যে সে বেদনা প্রশমন করা যায় না, তা এই দশ বছরের বালক বেশ ভালো করেই জানে। টেকনিকটা ছিল আসলে চোখের পানি দমন। পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকে ঈশা শিখেছিল, খুব বড় বড় করে অনবরত শ্বাস টানতে থাকলে অশ্রুজল আটকে দেওয়া যায়। কিন্তু আজ সেই কৌশলে তেমন কোনো কাজ হচ্ছে না। তবে এর পেছনে হয়তো একটা কারণও আছে। হাকিম বাউরির কাছে ঈশা শুনেছে, নিয়ম হলো চাবুক খাওয়ার সময় পুরো মস্তিষ্ক ফাঁকা করে দিতে হবে। কোনো করুণার প্রত্যাশা নেই, ক্রোধ নেই, আফসোস নেই। তবেই নাকি আঘাত সহ্য করাটা সবচেয়ে সহজ হয়। কিন্তু আজ কোনোভাবেই ঈশার মন শরতের মেঘমুক্ত আকাশের মতো ফাঁকা হচ্ছে না। হবেই বা কী করে! আজকের দিনটি ঈশার জন্য আর দশটি দিনের মতোও তো নয়!

মহররমের আর এক সপ্তাহ বাকি। মানে দু-বছর আগে আজকের দিনেই তাজ খান আর দরিয়া খান মিলে ঈশার বাপ সুলায়মানের কল্লা কেটে তাদেরই ঘরের সামনে ঝুলিয়ে দিয়েছিল। দিনটি ঈশার আজও পরিষ্কার স্মরণ হয়। চাইতেও হয়, আবার না চাইতেও হয়। ভোরে ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার আগেই সেদিন ঈশা আর ছোট্ট ইসমাইলের ঘুম ভেঙেছিল মায়ের হাঁকডাক শুনে, ইসলাম সুরির লোকজন নাকি এই আসল বলে! সকালে ঘুম ভাঙার পর ঈশার পেটপুরে হালুয়া-রুটি নয়তো খিচুড়ির সাথে কাবাব খাওয়ার অভ্যেস। কিন্তু সেদিন সকালে ঘুম ভেঙে যখন কিছুই সাজানো মিলল না, তখনই ঈশা টের পেয়েছিল—ঘটনা আসলে গুরুতর। এমন ঘটনা শুধু তখনই সম্ভব, যখন রসুইঘরে যাওয়ার মতো কারও অবসর নাই। আর রাজগৃহে রান্নার অবসর নাই মানে শত্রু অতি নিকটবর্তী। তখন যতদ্রুত সম্ভব পালানোর প্রস্তুতি চলতেছে। ঘরোয়া আড্ডায় মা-চাচিদের মুখে ঈশা এমন ঘটনা শুনেছে; তবে নিজের দেখায় এই প্রথম। ঘুম ঘুম চোখে তাই ঈশা বাপকে খুঁজতে যেতে চেয়েছিল। কারণ পিতার চেয়ে নিরাপদ আশ্রয় আর কে আছে!

ঈশার মা মোমেনা খাতুন অবশ্য তেমনটা হইতে দেন নাই। দিন-দুনিয়া তিনি যথেষ্ট ভালো বোঝেন। তার নাড়ছেঁড়া ধন যে সুলায়মান খানের পুত্র আর সুলতান মাহমুদ শাহের নাতি! হাতে পেলে তাজ খান কররানি আর দরিয়া খান সুরি জ্যান্ত ছেড়ে দেবে এমন আশা করা যায় না। তাই দুই নাবালক পুত্রের মুখে দুইটা চিনির ডেলা গুঁজে দিয়ে তিনি তাদের হাতির পিঠে তুলে দিয়েছিলেন—ত্রিপুরা পালাই যাওয়ার ভরসায়। তবে শেষ রক্ষা হয় নাই।

প্রথম প্রথম হাতির মাহুত খুব সাবধানে দুই ভাইকে নিয়ে জঙ্গলের পথে হুলগড় থানার দিকে রওনা দিয়েছিল। উদ্দেশ্য যতদ্রুত সম্ভব ত্রিপুরা ঢুকে যাওয়া। কিন্তু হাতি প্রাণীটা আসলে লুকানোর কোনো উপায় নাই। ব্রহ্মপুত্রের তীরে পৌছানোর আগে থেকেই কররানি আফগানরা ঘোড়া ছুটিয়ে যে তাদের হাতির পিছু নিয়েছে তা ঈশা দিব্বি দেখতে পাচ্ছিল। নদী পর্যন্ত পৌঁছে ঈশা আরও দেখল, তীরে আগে থেকেই আফগানরা হাতি আটকানোর মালসামান নিয়ে রেডি। পিছু ধাওয়া করে যারা আসতেছিল, তাদের আসলে আদৌ ওদের ধরার কোনো নিয়ত ছিল না। তাদের কাজ ছিল ঈশাদের হাতি খেদিয়ে নিয়ে ফাঁদে ফেলা। ঈশা এই সবই ঠিক তখনই বুঝে গেছে। শুধু বুঝতে পারে নাই ধরা পরার অর্থ আসলে কী! হাতির পিঠ থেকে যখন টেনে-হিঁচড়ে দুই ভাইকে নামানো হয়, তখনও ঈশা একরকম ভয় মিশ্রিত স্বস্তিই অনুভব করতেছিল বলা যায়। হাজার হোক, একা থাকতে হবে না। ছোট ভাইটার দায়িত্ব নেওয়া লাগবে না। যেখানে যেভাবেই থাকা হোক, অন্তত বাপ-মায়ের ছায়ায় থাকা যাবে।

বাড়িতে ফিরে আসতেই ঈশার সে ভ্রম দোমড়ানো কাগজের ঠোঙার মতো চুপসে গেল। অবশ্য বাড়ি না বলে তাকে ধ্বংসস্তূপ বলাই বেশি মানানসই। বেশিরভাগ ঘরই পুড়ে ছাই, বৈঠকখানার মাথা ছাড়িয়ে গনগনে আগুনের লেলিহান শিখা। শুধু পাথরের দরবার ঘরটা একা মাথা তুলে দাঁড়ায়ে আছে; যদিও ভেতরে শুধু ছাই-ভস্ম। দরবার ঘরের ঠিক সামনেই খাঁড়া করে একটা বর্শা পুঁতে তার আগায় সুলায়মান খান ওরফে কালিদাস গজদানির মাথা গেঁথে দেওয়া হয়েছে। আশপাশ থেকে বেশকিছু লোক জড়ো হয়েছে সেই তামাশা দেখতে। এদের মাঝে অনেককেই ঈশা চেনে—এমনকি ঘি-মাখন দিয়ে যাওয়া ঘোষ কাকাদের ছেলেটাও আছে। ঈশা প্রথমে ঠিক বুঝতেই পারে নাই, এটাই যে তার পিতার দেহাবশেষ। রক্তাক্ত জিভ বের করে এক অদ্ভুত ভেংচিতে আটকে যাওয়া সেই ভয়ংকর খুলিটার দিকে ক্ষণ কতক চেয়ে থাকার পর হঠাৎই ঈশার বুকে সমুদ্রসম মমতা উথলে ওঠে যে। এই সেই মুখ, যে প্রতি রাতে কপালে চুমু না খেলে ঈশা বিছানায় ওঠার নামও নিত না। সেই হাসি, সেই সাহস, সেই ক্রোধ,

অধ্যায়-২

কপালে থাকিলে দেখো পইড়া পায় সোনা
আবার মায়ের হাতের পিঠা খাইয়া মরে সাত জনা,
গাছ থিকা পইড়া মরে রূপে-গুণে সাঁই
বলদের শিঙে বাইজা মরে পালোয়ান ভাই...

মাঝারি সাইজের একটা কাঠের গুঁড়ি পালিশ করে বানানো মোড়ায় বসে ঢুলতে ঢুলতে ঈশার কানে পরপর তিনটা ঢোলের আওয়াজ ঢোকে। অর্থাৎ বিশ্রাম শেষ, এখন চোখ খুলতে হবে। তবে প্রথম দু-বারের চেষ্টায় সে কাজে ঈশা আধাআধি সফল হয়। কপাল আর খুলির ক্ষত থেকে চুইয়ে নামা রক্তের ধারা শুকিয়ে তার বাম চোখ একরকম বুজে গেছে। সেটিকে রীতিমতো আঙুল দিয়ে টেনে খুলতে হলো। ডান চোখটি নিজ ক্ষমতায় খোলা বা বন্ধ করা গেলেও সেখানে নজর কিছুটা ঝাপসা। সেই প্রথম রাউন্ডে কনুইয়ের গুঁতো খেয়ে জল ঝরা শুরু হয়েছিল, তখন থেকেই ঝাপসা; কিন্তু এখন এতসব কিছু ভাবনার সময় নাই। ঈশা দু-পায়ে যথাসম্ভব সিনাটান করে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে সেখানেও কিছুটা ব্যর্থ হয়; পিঠের ক্ষতটার জন্য পারা যাচ্ছে না। খানিকটা কাত হয়ে দাঁড়ানো সতেরো বছরের ঈশা ঝাপসা নজরে প্রতিপক্ষের দিকে তাকায়। বিশালদেহী কুৎসিত কালো মানুষটাকে দেখে বহুদিন পর আজ তার সিদি বরকতের কথা স্মরণ হয়।

ঈশা আর ইসমাইলকে যেদিন দাস হিসেবে জাহাজে তুলে দেওয়া হলো, সেদিনই খোলের ভেতর আরও একত্রিশ জন দাসের পাশাপাশি তাদের সিদি বরকতের সাথে পরিচয়। সে এক বিশালদেহী মুশকো জওয়ান হাবশি গোলাম। সুলতান রুকনউদ্দিন বরবক যখন আশি হাজার হাবশি গোলাম কিনে বাংলায় এনেছিলেন, তখন তাদের মাঝে সিদি বরকতের পূর্বপুরুষও ছিল। সময়ের সাথে সাথে একদিন সেই পূর্বপুরুষ এমনকি বাংলার পাইকদের ছোটখাটো সেনাপতিও হয়েছিলেন। বলাবাহুল্য, সেইসব ভালো দিন বরকতের খুব বেশিদিন যায় নাই। সুলতান হোসেন শাহের ধাওয়া খেয়ে বনে জঙ্গলে পরিবার-সহ কাটিয়েছেন বহুদিন। কিন্তু বাঙ্গালায় হাবশি চামড়া লইয়া সাধারণত খুব বেশিদিন লুকায় থাকা যায় না, সিদি বরকতের পরিবারও সেইটা পারে নাই। পাঠানরা তাদের ফাঁদ পেতে ধরেছে, তারপর বেঁচে দিয়েছে যেখানে যেমন পারে।

সিদি বরকতও বিক্রি হয়েছে অসংখ্যবার। আখের ক্ষেত থেকে শুরু করে প্রাসাদের মলমূত্র পরিষ্কার, হেন কাজ নাই যা বরকত জীবনে করে দেখে নাই। দু-একবার ভাড়াটে সৈনিক হিসেবেও খাটতে হয়েছে। সে কাজে বরকতের নাক এতবার ভেঙেছে যে, তার আদি আকৃতি আন্দাজ করার কোনো উপায় আর নাই।

আজকের প্রতিদ্বন্দীর ভেঙে থেবড়ে যাওয়া নাক দেখে ঈশার বুকের ভেতর সিদি বরকত স্মরণে কোথায় যেন এক সহানুভূতির সুর বেজে ওঠে। হাজার হোক, জাহাজের খোলের ভেতর নিষ্ঠুর সেই পরিবেশে ওই মানুষটাই তাদের দুই ভাইকে বুকে আগলে রেখেছিল। কিন্তু তাই বলে করুণা প্রদর্শনের কোনো সুযোগ ঈশার হয় না।

বিস্তীর্ণ গম ক্ষেতের মাঝে খানিকটা জায়গা গোল মতোন পরিষ্কার করে আজকের লড়াইয়ের আয়োজন হয়েছে। এরূপ আয়োজন সপ্তাহের প্রায় প্রতিটা দিনই হয়। সারাদিন শুয়ে-বসে থেকে বিরক্ত হয়ে যাওয়া দাস মালিকদের জন্য এ বেশ ভালো বিনোদন। তবে সবদিনই ঈশাকে লড়তে হয় এমন না। ঈশার মালিক চতুর লোক, সব লড়াইয়ে তিনি নিজের দাস খাটান না। সাধারণত যেদিন বাজি-বাট্টা বেশি চলে, সেদিন স্পেশাল আকর্ষণ হিসেবে ঈশা কিংবা রিজার্ভে থাকা আরও ছয়টা ছেলের কেউ একজন ময়দানে নামতে বাধ্য হয়।

আর সব লড়াইয়ের মতো আজকের প্রতিপক্ষের নামও ঈশার জানা নাই। শুধু জানে, এ একসময় মস্ত নামকরা লড়াকু সৈনিক ছিল। আজ ভাগ্যের ফেরে দাসত্ব বরণ করে গম ক্ষেতে জান হাতে নিয়ে নেমেছে। মালিক বলেছেন, প্রতিপক্ষ নাকি উলুস কাজাখদের থেকে শেখা অদ্ভুত এক কৌশলে ফাইট দেয়। মাটিতে দু-পা গেড়ে শক্ত হয়ে দাঁড়ায়, এরপর নাকি তার ধারেকাছে আর ঘেঁষা যায় না। তার ঘুসি এতটাই প্রচণ্ড যে, একটাতেই মস্ত জোয়ান সব লোক স্পটে কাত হয়ে যায়।

ঘটনা আসলে পুরোপুরি সত্য নয়। ঈশা আজ যার বিরুদ্ধে লড়ছে তার নাম আবুল বিল্লাল। বিখ্যাত সাহাবি বিল্লাল ইবনে রাবাহর নামে বাপ-মায়ের শখ করে রাখা নাম। কিন্তু বিল্লাল (রা.)-এর জীবনে মহানবি (সা.) যেমন ত্রাণকর্তা হইয়া উপস্থিত হইছিলেন, তেমন কেউ আবুল বিল্লালের জীবনে আসে নাই। একজীবনে কাসিম বিন জানিবেকের সেনাদলে নাম লিখায়েছিলেন। সেই সময়টা যে তার ভালো গেছে তাতে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু সৈনিক রেপুটেশনের জেরেই বিল্লাল দাসত্ব বরণের পর তার কপালে শান্তিপূর্ণ কোনো কাজ জুটে নাই। আবুল বিল্লালকে তার মালিক একের পর এক লড়াইয়ে নামায়েছেন। সত্য বললে, তারে কেনাই হইছিল বাজিতে লড়াই করার উদ্দেশ্যে। সেই উদ্দেশ্য সফল। বিল্লাল লড়াই জিতে তার মালিকের কোঁচে ঢের পয়সা তুলে দিছেন।

কিন্তু সবচেয়ে ভালো বলদটাও বয়স হইলে একদিন যেমন জোয়ালের নিচে ভেঙে পড়ে, তেমনই বিল্লালের দেহও ভাঙতেছে। তার মুঠিতে আর আগের জোর নাই। শক্ত করে পায়ের পাতা মাটিতে গেড়ে দাঁড়ালে বাম হাঁটুর কাছে অদ্ভুত এক শিরশিরে ব্যথার অস্তিত্বও আজকাল সে বেশ ভালো করে টের পায়। তাই গত কয়েকটা ম্যাচে সে হেরেছে। শেষ ম্যাচে তো রীতিমতো গোটা চারেক দাঁত খুইয়ে বসেছে। বিল্লালের মালিক আমানুল্লাহ বেগ ব্যাপারটা নিয়া যথেষ্ট হতাশ। যে দাসের কাজ লড়াই জিতে পয়সা আনা, তার শরীর ভেঙে গেলে বেহুদা বসায় বসায় খাওয়ানোর কোনো মানে নাই। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিছেন, বিল্লাল যদি আজ না জেতে তবে আমৃত্যু লড়াই হবে। নামকরা একটা ফাইটার মউত অবধি লড়ে গেলে সে লড়াইয়ে আমানুল্লাহ বিশেষ বিনোদন পেয়ে থাকেন। বিল্লাল যদি পয়সা না আনতে পারে তবে বিনোদনই সই! সে উদ্দেশ্যেই বয়স্ক কিন্তু শক্তিশালী বিল্লালের বিরুদ্ধে তরুণ আর দ্রুতগতির ঈশাকে নামানো হইয়াছে। মারদাঙ্গা একটা গরম লড়াইয়ের আশায় তাই আজকের আসর হাউজফুল।

আজকের লড়াইয়ের হাতিয়ার বাঘনখ—দুই মাথায় ছোট দুইটা আংটি লাগানো তিন ফলার একখান ধারালো অস্ত্র। আংটি দুটো হাতের তর্জনি আর কনিষ্ঠাঙুলে পড়ে নিলে ঠিক যেন বাঘের থাবার মতো একখান থাবা তৈয়ার হয়। অস্ত্রটার উৎপত্তি ভারতে; তাই আমানুল্লাহ বেগ তাতে সানন্দে রাজি হয়েছেন। তিনি ভেবেছিলেন, ভারতে জন্ম বিধায় নিশ্চয় ঈশা অস্ত্রটার ব্যবহার জানে। আবুল বিল্লালকে স্রেফ আঁচড়ে ফেড়ে ফেলবে।

কিন্তু ঘটনা সে রকম হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে বিল্লাল বা ঈশা কেউই এই অস্ত্র পূর্বে কোনোদিন ব্যবহার করে নাই—দক্ষ হওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। তাই প্রথমদিকে লড়াইটা হয়েছে মূলত দুই আনাড়ির বিক্ষিপ্ত হাত পা ছোড়াছুড়ি। তখনই কপাল আর খুলিতে আঁচড় খেয়েছে ঈশা। তবে বদলে বিল্লালের বাম কাঁধ আর বুকের ডানপাশে দুটো আঁচড় বসিয়েছেও বটে। এরপর দুই প্রতিযোগীই তাঁদের নিজ নিজ পরিচিত স্টাইলে ফিরে গেছে। লড়াইটা আসলে জমেছে তার পর থেকেই। ঈশা তার গতি নিয়ে একের পর এক আক্রমণ চালায়ে খুঁটি গেড়ে বসা বিল্লালকে কোনোভাবেই কাবু করতে সফল হয় নাই। এইভাবে সমানে সমানে চলতে থাকলে কে আগে ক্লান্ত হয় সেইটাই আসলে খেলা। যেহেতু নড়াচড়া বেশি করা লাগে, তাই আগে ঈশার পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কিন্তু টগবগে তারুণ্যের এনার্জির সীমা কোথায় তা আন্দাজের উপায় নাই। এজন্য যত সময় যাচ্ছে, উভয় দিকেই বাজির পরিমাণও যেন লাফায়ে লাফায়ে বাড়তেছে। আমানুল্লাহ আর ঈশার মালিক—উভয়ের মুখেই তাই উপচে পড়া হাসি। গভীরভাবে লক্ষ করলে দুই দাস মালিকের হাসি যেন হুবহু একই রকম মনে হয়।

প্রথম ভ্রমণের স্মৃতিটা কোনোদিন মলিন হবে বলে মনে হয় না। হাজার হোক, এই পথেই তার প্রথম ঘোড়ায় সওয়ার হওয়ার অভিজ্ঞতা। যাত্রার প্রথমদিনেই চাচা কুতুবউদ্দিন চেয়েছিলেন, তায়বাদ থেকে ডিরেক্ট এক ধাক্কায় হেরাত চলে আসবেন। মাত্র পাঁচ জনের কাফেলায় চারটা অতিরিক্ত ঘোড়া। তাই একদিনে প্রায় চল্লিশ ক্রোশের এই পথ পাড়ি দেওয়া তেমন কোনো ঘটনা না। কিন্তু ঈশার জন্যই কাজটা সম্ভব হলো না। আষ্টেপিষ্টে কোনো রকম বিকেল পর্যন্ত ঘোড়ার পিঠে টিকে থাকার পর সে টের পেল, দেহে ব্যাপক যন্ত্রণা। বিভিন্ন রকম যন্ত্রণার সাথে ঈশার বেশ ভালো জানাশোনা; তাই প্রথম প্রথম সে ব্যাপারটা পাত্তা দেয় নাই। কিন্তু সূর্য যত লাল হয়, ঈশার দেহের নিম্নভাগ যেন ততই অসাড় হয়ে আসে। একটা সময় দেখা গেল, সে দু-পা দিয়ে পিঠ আঁকড়ে পর্যন্ত ধরতে পারতেছে না। তাই জেন্দেহ জান পার হওয়ার আগেই কাফেলা থামাইতে হলো। আসমানে সুর্য তখন ঢলে গেলেও পুরোপুরি ডোবে নাই। বেহুদা দিনের আলো নষ্ট, তাই কুতুবউদ্দিনের মেজাজ খিঁচড়ে আসে; তবুও মুখের হাসিতে তিনি সামান্য হেরফেরও হইতে দিলেন না। খুঁজে পেতে একটা উঁচু বালিয়াড়ি দেখে রাত কাটানোর সিদ্ধান্ত হয়। পাথরের বোল্ডারের সাথে ঘোড়াগুলো বেঁধে কুতুবউদ্দিন আর তার দুই দেহরক্ষী তাঁবু করার তোরজোড় শুরু করলেন।

ঈশার তখন অবস্থা বেহাল। মাটিতে বসতে গিয়ে মনে হলো, তার মেরুদণ্ডের ঠিক শেষ ভাগটায় কেউ দুরমুশ দিয়ে আচ্ছা মতোন পিটায়েছে। এদিকে পায়ের আঙুল নাড়াতে গেলে পুরো পায়ের পাতা বেদনায় অসাড় হয়ে আপনা-আপনিই মুচড়ে আসে। তবে সারাদিনের রোদ পাওয়া তপ্ত বালির উষ্ণতায় বসতে পেরে কিছুটা আরাম হলো। সে আরামে চোখ বুজে আসতেই দেখা গেল ইসমাইল হাজির; সে ভাইকে নিয়ে ঘোড়াকে দানা খাওয়াতে চায়। তায়বাদ শহর থেকেই ইসমাইল চাচা কুতুবউদ্দিনের পুরো ন্যাওটা হয়ে আছে। অবশ্য তারই-বা দোষ কী! বোধ-বুদ্ধি হওয়ার পর কোনো আত্মীয় দেখার সৌভাগ্য তার হয় নাই। তাই সদ্য দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া বালক যে তার নয়া আবিষ্কৃত পরিবার সর্বশক্তিতে আঁকড়ায় ধরতে চাইবে, তাতে অবাক হওয়ার কী আছে! তাই ঈশাও কোনো বাধা দেয় নাই। বয়সে ছোট আর আকৃতিতে দুবলা-পাতলা হওয়ায় ইসমাইলকে ঘোড়াতেও চড়তে হয়নি। কখনো কুতুবউদ্দিন আবার কখনো দেহরক্ষী দুজনের ঘোড়ায় রীতিমতো পা তুলে বসে এসেছে। তাই তার গায়ে বালকসুলভ উত্তেজনার শেষ নাই; কিন্তু ঈশার ভেতর সে উৎসাহের ছিটেফোঁটাও দেখা গেল না। সারা পথ চাচার সাথে থেকে এখন ঘোড়াকে দানা খাওয়াতে ভাই লাগবে কেন— এইটাও সে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। জবাব না দিয়ে সে গরম বালির

এখন মুক্ত পুরুষ; নতুন করে চাচার দাস নয়। তাছাড়া এখন তো আর সে কাফেরও নাই, দ্বীনের পথে চলে আসছে। এইসব চিন্তাভাবনা ঈশার মনে ঘুরপাক খায়, খেতে খেতে তার দুর্বল দেহ একসময় ক্ষুধার্ত পেটেই নিদ্রায় ঢলে পড়ে।

পরের দিনই কাফেলা হেরাত পৌঁছে গেল। কুতুবউদ্দিন শহরে পৌঁছে ইসমাইলের জন্য এক গাধায় টানা ছোট একটা গাড়ি খরিদ করলেন। এক ঘোড়ায় দুইজন তুলে সময় নষ্ট হচ্ছে। তিনি যত দ্রুত সম্ভব বাঙ্গালাহ ফেরত যাইতে আগ্রহী। এ বিষয়ে চাচার সাথে তার দুই দেহরক্ষীর খানিকটা মনোমালিন্যও হলো। কুতুবউদ্দিন কিরমান হয়ে কাবুল যাইতে চান। কারণ সেই পথে দ্রুত পৌঁছানো যায়। অন্যদিকে আফজাল আর হামজা দুইজনই নাদ-এ-আলির পথ ধরে কান্দাহার হয়ে ভারতে ঢুকতে আগ্রহী। কেননা, সেই রাস্তা অধিকতর নিরাপদ। তবে শেষ পর্যন্ত কোনোভাবেই কুতুবউদ্দিনকে টলানো গেল না। আফজাল আর হামজা যেমন করে হোক কাবুল পথের আগেই তাঁদের পৌঁছে দেবে এমন প্রতিশ্রুতিরও কোনো ফল হলো না। কুতুবউদ্দিনের এক জবান, দুইটা বাচ্চা ছেলে নিয়া তিনি কোনো অবস্থায়ই দাশত-এ-মারগোর ধারে-কাছে ঘেঁষবেন না। ওই পথ অধিকতর নিরাপদ, ঠিক আছে। কিন্তু নিরাপদ এইজন্য যে, সেই কঠিন মরুতে এমনকি জাত পাঠানও নিতান্ত জরুরি প্রয়োজন ছাড়া পা দেয় না।

ঈশাদের কাফেলা তাই শেষ পর্যন্ত কাবুলের পথেই ছুটল। কেননা পয়সা যার সিদ্ধান্তও তার। এদিকে প্রতিটি দিন যায় আর ঈশা যেন একটু একটু করে ঘোড়া প্রাণীটার পিঠে আরও শক্ত হয়ে বসে। বামিয়ান পার হয়ে সে ঘোড়ার পিঠ থেকে এমনকি স্যান্ডেল পর্যন্ত খুলে নিয়েছে। কারণ ভাঙা ভাঙা ফার্সিতে হামজা বলেছে, ঘোড়ার খালি পিঠে চড়তে না জানলে তখতেও কোনোদিন ভালো করে বসা হবে না। প্রথম প্রথম তাতে বেশ কষ্ট হয়েছিল; কিন্তু দেহ আস্তে আস্তে ঘোড়সওয়ারের বেদনায় অভ্যস্ত হচ্ছে। এ ছাড়া স্যাডল আর লাগাম খুলে ঘোড়ার খালি পিঠে বসে ঈশা হামজার বক্তব্যের সত্যতা হাড়ে হাড়ে টের পায়। ঘোড়ার মনমর্জি কোন অবস্থায় কেমন হয় তার ছাপ যেন প্রাণীটার পিঠের পুরো মাংসপেশিজুড়ে; শুধু সেই ছাপ পড়তে জানতে হয়। আর খালি পিঠে না চড়ে সে জিনিস শেখার উপায় কই!

টানা ছয় দিন ঘোড়া ছুটিয়ে ঈশাদের কাফেলা কোনো রকম ঘটনা ছাড়াই কাবুল পৌঁছে যায়। এরপর আদিনাপুর। তারপর পেশওয়ার। সত্য বলতে ঘোড়া থেকে ঈশার মাঝেমধ্যে ধপাস করে পড়ে যাওয়া ছাড়া পুরো পথেই তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা নাই। তবে ঈশার বাদামি মাদি ঘোড়াটা বেশ চতুর; আরোহী পড়ে যাচ্ছে বুঝতে পারলেই সে সাধারণত আরও শক্ত করে গা ঝাঁকি দিয়ে ঈশাকে ছুড়ে দেয়, তারপর লাফিয়ে নিরাপদ দূরত্বে সড়ে যায়। তেমনটা না হলে অন্তত কয়েকটা লাথি যে ঈশাকে খেতে হতো সে বিষয়ে এমনকি ঈশারও সন্দেহ নাই।

তবে ঘটনা ঘটল ঝিলাম নদী পার হয়ে জলন্ধরের পথ ধরার পর। আর দশটা দিনের মতোই সেদিনকার তাঁবু ফেলা হয়েছিল এক উঁচু টিলার মাথার ওপর। যবের রুটি দিয়ে শুকনো নোনতা মাংস পেটে পুরে তারা ঘুমিয়েও গিয়েছিল চাঁদ ওঠার আগেই। গন্তব্য যতই এগিয়ে আসছে, কুতুবউদ্দিন যেন ততই অস্থির হয়ে উঠছেন। এ ছাড়া ঈশা এখন ঘোড়ার পিঠে বেশ স্বাভাবিক। অবশ্য টানা একুশ দিন ওই প্রাণীটার পিঠে ষোলো ঘণ্টা করে সময় কাটালে স্বাভাবিক না হয়ে আর উপায় কী!

রাতের যখন প্রায় মধ্যভাগ, ঠিক সে সময় ঘোড়ার নাক ঝারার শব্দে ঈশার হঠাৎ ঘুম চটে গেল। আকাশে তখন কৃষ্ণপক্ষের ঘোলাটে চাঁদ, বিস্তীর্ণ চরাচর ভাসানো কালচে রুপালি আলোয় ভালো করে কিছু দেখার জো নেই। তবে আফজাল আর হামজাও যে সম্পূর্ণ সজাগ সেই ব্যাপারটাও ঈশার নজর এড়াল না। দুজনই উঠে দাঁড়িয়েছে; আফজালের হাতে একখানা খাপ খোলা বাঁকা শমসের। চাঁদের রুপালি আলোয় সে তলোয়ার ঝিক করে উঠতেই ঈশার মনের কোথায় যেন এক অশনি সংকেত কু ডেকে যায়। দুই দেহরক্ষীর বিশ্বাসঘাতকতার ভয় সে করে না; তেমনটা হলে আগেই যথেষ্ট সুযোগ ছিল। সত্য বলতে, আজকের চাইতেও ঢের ভালো সুযোগ ছিল। শঙ্কাটা ভিন্ন জায়গায়; চকচক করতে থাকা তলোয়ার চাঁদের আলোয় অনেক দূর থেকে চোখে লাগে। বিপদ যদি আসেই তবে নিজের অবস্থান বা প্রস্তুতি জানান দেওয়ার কী প্রয়োজন—এই প্রশ্নটা ঈশা মাথা থেকে ঝেড়ে উঠতে না উঠতেই হামজা আচমকা বেশ শব্দ করে হেসে উঠল। পশতুতে কিছু বলে সে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল; কিন্তু ঈশার দিকে পুরোপুরি ফেরার আগেই যেন ভোজবাজির মতো একখান তির উদয় হয়। রাতের শুকনো বাতাস কেটে মৃদু বোঁ-বোঁ আওয়াজ তুলে উড়তে উড়তে সেই তির হামজার বাম বাহু ভেদ করে ঢুকে যায় অন্তত ইঞ্চি দুয়েক।

ঘটনার আকস্মিকতায় ঈশা ক্ষনিকের জন্য বিহ্বল হয়ে গেলেও সে সময় কুতুবউদ্দিন এক ঝটকায় শোয়া থেকে উঠে দাঁড়ায়। তারও ঘুমও ভেঙেছে বেশ কিছুক্ষণ আগে; কিন্তু কোনো সাড়াশব্দ দেন নাই। চাচার প্রথম চিন্তা নাবালক ভাতিজাটারে নিরাপত্তা দিতে হবে; সে লড়াই জানে না। তাই ইসমাইলকে আড়াল করে কুতুবউদ্দিন বর্শা বাগিয়ে মাটিতে শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। ততক্ষণে তিন দিক থেকে অন্তত সাত জন ডাকাত ঈশাদের ক্যাম্পে ঢুকে গেছে। তাঁদের মুখে কালো কাপড়, মুঠিতে উদ্যত হাতিয়ার।

আল্লাহু আকবার রবে হঠাৎই সেই বিরান প্রান্তর প্রকম্পিত হয়। মনে জিঘাংসা লয়ে ডাকাত আর তার শিকার উভয়ই মহান রবের জয়ধ্বনী দিয়ে ঝাঁপায়ে পড়ে একজন আরেকজনের ওপর।